Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2012 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 017-022
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশে কৃষির রূপান্তর ঃ সম্ভাবনার শেষ নেই[১]

প্রফেসর এম. এ. সাত্তার মন্ডল*

১. পঞ্চাশ বছর আগে নোবেলজয়ী কৃষি অর্থনীতিবিদ থিয়োডোর শূল্জ তাঁর ‘সনাতন কৃষির রূপান্তর’ বইতে বলেছিলেন, অনুন্নত দেশের ‘কৃষকরা দক্ষ, কিন্তু দরিদ্র’। কাজেই তাদের জন্য প্রয়োজন নতুন প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী এ.টি. মোশেরও তাঁর ‘কৃষিকে এগিয়ে নেয়া’ শীর্ষক বইতে ফসল চাষের নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি এসেছে, বেড়েছে সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ এবং রূপান্তর ঘটছে সনাতন কৃষিতে। এ প্রবন্ধে কৃষির রূপান্তর প্রক্রিয়ার ওপর কিছু আলোকপাত করছি।

২. বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টিতে মাটির জো বুঝে দেশী আউশ আমন ধান ও পাট বোনা হতো মাঠ জুড়ে। সময়মত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও ঝড় শিলাপাত না হলে শ্রাবণে আউশ উঠতো, ভাদ্রে পাট কেটে বর্ষার ভাসা জলে জাক দেয়া হতো। বোনা আমন ধানের গাছগুলো বেড়ে উঠতো বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে। বর্ষার পানি নেমে গেলে আমন ধানের খেতেই খেসারি, মাস কলই, মুগ ডাল বোনা হতো। খেসারি ছিল গবাদি পশুর প্রধান খাবার। আমন ধান ও পাট উঠে গেলে ছোলা মসুরি বোনা হতো, উঠে আসতো ফাল্গুন চৈত্র মাসে। ধানের ফলন ছিল খুবই কম। ১৯৬৯/৭০ সালে একর প্রতি ধানের ফলন ছিল আধা টনের কম। আর বান বন্যা খরা শিলাবৃষ্টি হলে তো সমূহ সর্বনাশ। ১৩৫০ এর মন্বন্তরে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশে ফসল হানির কারণে খাদ্যাভাব ও অনাহার অপুষ্টিতে ৩৫-৩৮ লক্ষ মানুষ মারা যায়। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও মার্কিন গবেষক পল গ্রীনাফ বাংলার দুর্ভিক্ষের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এখন অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। একর প্রতি এখন সোয়া এক টন, প্রায় তিনগুণ ধান উৎপাদিত হয়। ম্যাজিকটা হচ্ছে, তখন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান বলতে গেলে করাই হতো না। মাত্র ৩ শতাংশ জমিতে ইরি ধান করা হতো। আর এখন ৮৭ শতাংশ জমিতে উফশী ধান করা হয়। উফশী ধান, যা ইরিধান নামে পরিচিতি, তার আবিস্কারই হয়েছে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। ফসল প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে। এখন সারা বছর ক্ষেতে ধান হয়, মৌসুমী সব্জি করবে বলে কৃষক বসে থাকে না। বিজ্ঞানের বদৌলতে এখন সারা বছর ধরে টমেটো, বেগুন, শসা, পাতা শাক, হরেক

১ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অধ্যাপক ড. আখলাকুর রহমান স্মারক বক্তৃতা হিসাবে উপস্থাপিত। প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজের এবং তার প্রতিষ্ঠানের নয়।

* সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

জাতের দেশি বিদেশী ফলমূলের আবাদ হয়। এ এক নতুন কৃষি। এসব সম্ভব হচ্ছে বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে ফসল উৎপাদনে আধুনিক কৃৎকৌশল ও দ্রুত প্রযুক্তি প্রসারের ফলে। এটা কৃষি রূপান্তরের একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য।

৩. আরেকটু খোলাসা করা যাক। ৫০ বছর আগে দেশের মোট সোয়া দুই কোটি একর আবাদী জমি কমতে কমতে ২০০৮ এর কৃষি শুমারী অনুযায়ী ১ কোটি ৮৮ লক্ষ একরে নেমে এসেছে। অথচ সেসময় যেখানে মোট চাল উৎপাদন হতো ৮০ লাখ টনের মত, তা বর্তমান সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারগুণ। এই সময়ে জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। প্রতি বছর লোক সংখ্যা বাড়ছে গড়ে ২০ লক্ষ করে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে মাথাপিছু বছরে যেখানে মাত্র ১২০ কেজি চাল উৎপাদন হতো, তা বেড়ে বর্তমানে ২২০ কেজি হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এটা সম্ভব হচ্ছে আবাদযোগ্য জমি দ্রুত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও। এর নাম সবুজ বিপ্লব, প্লান্ট ব্রীডার ও কৃষি বিজ্ঞানীরা যার কারিগর।

৪. কেবল চাল কেন? ৭০ এর দশকের মাঝামাঝি যেখানে তরল দুধের উৎপাদন ছিল ৫ লক্ষ টনের মত, তা সম্প্রতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ লক্ষ টনে। ঐ সময়ে ডিম উৎপাদন হতো ১৩০ কোটি, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭৪ কোটিতে। পোল্ট্রি বিজ্ঞানী ও খামারিদের এ অবদানকে সাদা বিপ্লব বলা যায়। আর মাছ? এক সময় মনে হয়েছিল যেভাবে নদীনালা বিল বাওড় শুকিয়ে যাচ্ছে তাতে আমাদের শিশুদের বোধ হয় ছবি দেখে মাছ চিনতে হবে। সাবাস, আমাদের মৎস্য বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন ও বেসরকারি খাতের উদ্যোগে আজ রুই, কাতলা, থাই কই, পাঙ্গাস, তেলাপিয়াসহ হরেক রকমের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। ৭০ এর গোড়ার দিকে যেখানে সোয়া ৮ লাখ টন মাছ উৎপাদন হতো প্রধানত মুক্ত জলাশয়ে তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ লাখ টনে, যার শতকরা ৮০ ভাগের বেশি চাষ হয় অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও পুকুরে। উল্লেখ্য যে, ধানের তুলনায় মাছ চাষ অধিক লাভজনক হওয়ায় ধানের জমি মাছের পুকুরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতির তুলনামূলক লাভ মেনেই এটা হচ্ছে।

৫. কৃষি উৎপাদনে এই যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রথমে খামারের কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা ধরা যাক। ১৯৮৩/৮৪ থেকে ২০০৮ সময়ে খামারের সংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ, অথচ একই সময়ে আবাদী জমি হ্রাস পেয়েছে ৭ শতাংশ। ফলে খামারের গড় আয়তন ২ একর থেকে ১.২৬ একরে নেমে গেছে। সংগে সংগে বেড়েছে জমির খন্ডায়ন ও বিভাজন। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা ৭০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষে পৌঁছে। ইতোমধ্যে হয়তঃ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অপর দিকে মাঝারী কৃষকের সংখ্যা সামান্য হ্রাস পেলেও বড় কৃষকের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, ভূমি থেকে নিষ্ক্রমণ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে জমির একত্রীকরণের মাধ্যমে খামারের আয়তন বাড়ার তত্ত্বটি বাংলাদেশে প্রযোজ্য হয়নি। এ অবস্থায় যা হবার কথা, ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা উল্লেখিত সময়ে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা কৃষি ও অকৃষি খাতে নিয়োজিত থাকছে। এদের একটা অংশ অবশ্য ভিটেমাটি বিক্রি করে কাঁচা সোনা রোজগার করতে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

৬. খামারের গড় আয়তন হ্রাস পাওয়ায় ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, এমন কোন মাঠ পর্যায়ের তথ্য জানা নেই। কাজেই ৭০ এর দশকে খামার পর্যায়ের গবেষণায় ক্ষুদ্র কৃষকরা যে বড় কৃষকদের তুলনায় জমির একক প্রতি বেশি উৎপাদনশীল, তা এখনও প্রযোজ্য। তবে, অতি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনশীলতা কম হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে, সেচ, সার ও কেনা শ্রমের উপর নির্ভর করে ধান চাষ করা মোটেই তাদের অনুকূলে নয়। এ অবস্থায় প্রান্তিক চাষীদের

অনেকেই, যাদের পারিবারিক শ্রম আছে, ধান চাষ ছেড়ে শাক-সব্জি ও ফলমূল চাষে ঝুকে পড়েছে। আর অনেকে আধুনিক চাষাবাদের খরচ পোষাতে না পেরে কৃষি কাজ ছেড়ে অকৃষি পেশাতে চলে যাচ্ছে। যারা কৃষি শ্রমিক হিসাবে থেকে যাচ্ছে, তারা মজুরি বৃদ্ধির সুফল লাভ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০-৯১ সালে একজন কৃষি শ্রমিক যেখানে একদিনের মজুরি দিয়ে ৩.৫ কেজি মোটা চাল কিনতে পারতো, বর্তমানে ৯.৫ কেজি চাল কিনতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চালের দামে মূল্যস্ফীতির তুলনায় কৃষি মজুরি মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি হওয়ায় এমনটি হয়েছে। এটি গরীব কৃষি শ্রমিকদের জন্য নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে, তবে উৎপাদকদের জন্য মোটেই সুখকর নয়। বিশেষ করে, যে সকল কৃষক পুরোপুরিভাবে কেনা শ্রমের উপর নির্ভরশীল তাদের সবচেয়ে অসুবিধা। তাদের জন্য ধানের উৎপাদন খরচ মিটিয়ে কিছু লাভ করা প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থায় অনেক মাঝারী ও বড় কৃষক জমি বর্গা বা বন্ধকী দিয়ে দিচ্ছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কাছে। এটাকে বলে 'বিপ্রতীপ বর্গা'। বর্গা প্রথারও ধরণ পাল্টাচ্ছে। ভাগ চাষ প্রথার স্থলে এখন বছর চুক্তিতে বা নগদ অর্থে বর্গা ব্যবস্থার বেশি প্রচলন দেখা যাচ্ছে। এটি কৃষিতে বাণিজ্যিকায়নের লক্ষণ এবং ইতিবাচক। এই ব্যবস্থায় যারা নগদ অর্থ বিনিয়োগ করছে, তারা লাভের অংক বাড়ানোর লক্ষ্যে বেশি অর্থকরী ফসল, ফল, এমনকি মাছের চাষও করছে এবং উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে।

৭. এ অবস্থায় করণীয় অনেক। প্রথমতঃ উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ দরকার। সার ও সেচের ওপর ভর্তুকি দিয়ে এটা সম্ভব নয়। বরং এটা সমস্যার টেকসই সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টাকে স্তিমিত করে দিতে পারে। আমি বলতে চাই, যেহেতু ধান উৎপাদন খরচের ৪০ শতাংশই শ্রমিকের মজুরি দিতে চলে যায়, সেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থায় ইতোমধ্যেই যান্ত্রিকায়নের যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে তাকে নীতি প্রনোদনা দিয়ে আরও ত্বরান্বিত করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ খরচ কমানোর জন্য ক্রমাগত উচ্চফলনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবনের সরকারের নীতি সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ইতোমধ্যেই অনেকগুলো দারুণ সম্ভাবনাময় উফশী ধান ও অন্যান্য ফসলের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে এবং অনেকগুলো গবেষণাধীন রয়েছে। আরও উন্নত, হাইব্রীড ধান উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। সেই সঙ্গে, জিএম ফুডের কথাও মাথায় রাখা প্রয়োজন। খরা, লবণাক্ততা ও বন্যা সহিষ্ণু জাতের ধান উদ্ভাবিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা সহজ হবে। ব্রি-ধান ৪৭, ব্রি-ধান ১১, ৩৩, ৪২, ৪৩ এবং বিনা ধান-৮ উল্লেখযোগ্য। এজন্যে কৃষি গবেষণার জন্য সরকারি বাজেট বরাদ্দ যেমন বাড়ানো দরকার, তেমনি বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে কর্ম সংযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে, বায়োটেকনোলজি গবেষণার ওপর বেশি জোর দেয়া দরকার। তৃতীয়তঃ ধান উৎপাদন খরচের প্রায় ৩০ শতাংশ যায় সেচের জন্য। সেচ ও সারের খরচ কমানোর লক্ষ্যে যেসব গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কাজ হচ্ছে, সেগুলোকে দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেচ পাম্প চালানোর জন্য ডিজেলের পরিবর্তে সৌর বিদ্যুৎ, গ্যাস সিলিন্ডার, উন্নত ডিজাইনের পাম্প ব্যবহার ইত্যাদি কলা কৌশল যাতে দ্রুত প্রসার লাভ করে সে ধরণের বিনিয়োগ প্রকল্পে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ দেয়ার প্রয়োজন। সর্বোপরি, কৃষি পণ্যের নিম্ন দামের কথা বলা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, মোটামুটি হিসাব করে দেখা গেছে যে, বর্তমান বাজার দরে সেচযুক্ত বোরো ধানের উৎপাদন খরচের ওপর কিছু লাভ করতে হলে ধানের দাম বর্তমানের মন প্রতি ৫০০-৫৫০ টাকার স্থলে কমপক্ষে ৮০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন। এতে গরীব মানুষের খাদ্য শস্যের ব্যয় যেটুকু বাড়বে তা গ্রামীণ

শ্রমজীবী মানুষদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। তবে, শহরে গরীব মানুষদের জন্য একটু কষ্টকর হতে পারে। সেটা মোকাবেলার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। এ কর্মসূচীতে কেবল চাল নয়, ভোজ্য তেল, ডাল, ফল ও গুড়ো দুধও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৮. কৃষির সাথে শিল্প খাতের বিনিময় হার বরাবরই কৃষির বিপক্ষে। এটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে কৃষির অনুকূলে আনা দরকার। নব্বুই এর দশকের গোড়ার দিকে ১ মন ধান বিক্রি করে ১ বস্তা ইউরিয়া সার কেনা যেত। আর ২০১২ সালে ১ বস্তা ইউরিয়া কিনতে কৃষককে ২ মন ধান বেচতে হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি ১ ড্রাম ডিজেল কিনতে সেচযন্ত্রের মালিকের ৮ মন ধান লাগতো, আর ২০১২ সালে লাগছে ২৭ মন। ১৯৯০ সালে ১৬০ মন ধানের টাকায় ১টি পাওয়ার টিলার কেনা যেত, এখন লাগছে ১৭০ মন। এ ধরণের প্রতিকূল কৃষি ও শিল্প পণ্যের বিনিময় হার অব্যাহত থাকলে কৃষির উন্নতি হলেও কৃষকের তেমন লাভ হবে না। ফলে, কৃষিতে বিনিয়োগ না হওয়ায় ইপ্সিত রূপান্তর থেমে গিয়ে খাতটি আবার অনুৎপাদনশীলতার ফাঁদে পড়ে যেতে পারে।

৯. কৃষির রূপান্তর প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসাবে শ্রমশক্তির বিভাজনেও লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। এটাকেও ভালোভাবে বোঝা দরকার। গত এক দশকে কৃষিকর্মে নিয়োজিত ১৫ বছর ও তদুর্দ্ধ বয়সের শ্রম সংখ্যা ১১ শতাংশ কমে গেছে। কিন্তু অ-কৃষি খাতের শ্রমসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৫০ ভাগ। মোট শ্রমশক্তি বেড়েছে শতকরা ৫ ভাগ। ১৯৯৯-২০০০ সালে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিক ছিল শতকরা ৬৩ ভাগ, অকৃষি খাতে ছিল ৩৭ ভাগ। ২০১০ সালে কৃষি শ্রম সংখ্যা নেমে এসেছে শতকরা ৪৭ ভাগ, আর অ-কৃষিখাতে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ ভাগ। শ্রমের লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনও লক্ষণীয়। কৃষিতে পুরুষ ও মহিলা শ্রম উভয়ই কমে গেছে। তবে পুরুষের চেয়ে মহিলা শ্রম হ্রাস পেয়েছে অধিক হারে। অ-কৃষি খাতে পুরুষ ও মহিলা শ্রম দুটোই বেড়েছে- পুরুষ শ্রম ৫০ শতাংশ এবং মহিলা শ্রম ৩৬ শতাংশ হারে। কৃষিতে শ্রমশক্তি হ্রাস নির্দেশ করে যে ফসল উৎপাদন কাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন-জমি কর্ষণ ও জমি তৈরির কাজে ক্রমবর্ধমান হারে যান্ত্রিক চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কায়িক শ্রমের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। ফসল কাটা ও মাড়াই কাজে ব্যবহৃত পুরুষ ও মহিলা শ্রম দুটোই হ্রাস পেয়েছে। এ কাজগুলো প্রধানত মহিলাদের কাজ ছিল এবং ব্যাপকভাবে থ্রেসার ও কোথাও কোথাও ড্রায়ার মেশিন ব্যবহারের ফলে ফসল মাড়াই, শুকানো ও পরিষ্কারকরণ ইত্যাদি কাজ থেকে মহিলা শ্রম অবমুক্ত হয়ে তারা আরও উৎপাদনশীল ও লাভজনক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। যেমন, হাঁস মুরগী পালন, গৃহাঙ্গনে শাকসব্জির চাষ, মৎস্য চাষ, প্লান্ট নার্সারি ইত্যাদি কাজে মহিলাদের আগ্রহ বাড়ছে।

১০. শ্রম শক্তির ধরন ও ব্যবহারের এসব পরিবর্তন কতকগুলো ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়। যেমন, সনাতন কৃষি তুলনায় বর্তমান বহুমাত্রিক কৃষিতে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের কাজের বিভাজন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। নারী শ্রমিকরা এখন কেবল ফসল কর্তনোত্তর কাজে সীমাবদ্ধ না থেকে সরাসরি উৎপাদন কাজেও যুক্ত হচ্ছে। যেমন সেচ যন্ত্র চালনা, চারা রোপন, নিড়ানী যন্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি। অবশ্য, পুরুষ ও নারী শ্রমের মজুরির ব্যবধান এখনও বিদ্যমান। কার্য ভেদে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় ৩০-৫০ শতাংশ কম মজুরি পায়, যেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে লক্ষণীয় যে, মজুরি প্রদানের ধরন পাল্টে যাচ্ছে। বাণিজ্যিক কৃষি যতই প্রসারিত হচ্ছে, ততই খাবারসহ মজুরি প্রথার জায়গায় খাবারবিহীন পুরো মজুরি নগদ অর্থে প্রদানের প্রচলন বাড়ছে। সমসাময়িক শ্রম বাজারের আরেকটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। দিন ভিত্তিক শ্রম ব্যবহারের স্থলে চুক্তি ভিত্তিক শ্রমের ব্যবহার বাড়ছে। এটার সুবিধা হচ্ছে এই যে শ্রম নিয়োগকারীকে শ্রমিকের কাজ তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকতে হয় না। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক তার সুবিধামত সময়ে

এবং প্রয়োজনে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শ্রমিক ব্যবহার করে দ্রুত কাজ শেষ করে অন্য কাজে চলে যেতে পারে এবং মজুরি নির্ধারণেও দরকষাকষির সুযোগ বাড়ে। এটাও কৃষি শ্রম বাজারে বাণিজ্যিকায়নের লক্ষণ।

১১. আগেই বলা হয়েছে, কৃষিতে যে রূপান্তর ঘটছে তার অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে টেকসই প্রযুক্তির প্রসার। বিশেষ করে, যান্ত্রিক সেচ প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার কৃষি বৈচিত্র্যায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে উল্লেখযোগ্যভাবে, যদিও সেচ এখনও প্রধান খাদ্য শস্য ধান উৎপাদনেই মূলত সীমাবদ্ধ রয়েছে। ৮০ দশকের গোড়ার দিকে যেখানে মাত্র ১৪ হাজার গভীর নলকূপ এবং ৫ লক্ষ অগভীর নলকূপ ছিল, সেখানে ২০০৯-২০১০ সালে ৩৩ হাজার গভীর নলকূপ, ১৪ লক্ষ অগভীর নলকূপ এবং সেই সঙ্গে লাখ খানেক পাওয়ার পাম্প ব্যবহারের ফলে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে যা মোট আবাদী জমির প্রায় ৭০ ভাগ। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থাপনা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার পর সেচের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেচ যন্ত্রের দাম কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এসেছে, সেচ পাম্প ও ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে এবং সারাদেশে প্রায় ৬ লক্ষ গ্রামীণ মেকানিক তৈরি হয়েছে। এর ফলে, সেচ পানির বাজার যথেষ্ট প্রতিযোগী হয়েছে এবং ক্ষুদ্র কৃষকরা সেচ ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে। সেচ ব্যবসা প্রসারের জন্য অথবা ঝুঁকিপূর্ণ এ ব্যবসায় লাভজনকভাবে টিকে থাকার জন্য ক্ষুদ্র কৃষি উদ্যোক্তারা প্রয়োজনে ব্যবসায় অংশীদার নিচ্ছে, যাদেরকে 'শ্যালো টিউবওয়েল কোম্পানী' হিসাবে অভিহিত করা যায়। প্রথম দিকে সরকারী মালিকানাধীন গভীর নলকূপ সেচ ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, কারিগরী ত্রুটি ও অনেক ক্ষেত্রে সেচের পানি বন্টনে স্থানীয় বড় কৃষকদের মনোপলি প্রভাব খাটানোর প্রেক্ষিতে যারা সেচ যন্ত্র মালিকদের 'ভূ-স্বামী থেকে জলস্বামী' বলে চিহ্নিত করেছিলেন তাদের আশংকা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বেসরকারি খাতে সেচ ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে অগভীর নলকূপ হচ্ছে আধুনিক কৃষি রূপান্তরের মূল চাবিকাঠি। তবে, সাম্প্রতিক কালে কোথাও কোথাও সেচ মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া এবং কোনও কোনও নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

১২. সেচযন্ত্র প্রসারের ধারাবাহিকতায় যান্ত্রিক চাষাবাদের প্রচলনও ঘটেছে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে। স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়ার দিকে মাত্র হাজার তিনেক চার চাকার ট্রাক্টর ও ৬-৭ হাজার দুই চাকার পাওয়ার টিলার ছিল। তখন জমি কর্ষণের প্রধান প্রযুক্তি ছিল গরু মহিষ দিয়ে কাঠের লাঙ্গলের ব্যবহার। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী তখন ২৭ শতাংশ কৃষক পাওয়ার টিলার ব্যবহার করতো এবং যান্ত্রিক চাষকৃত জমি ছিল ৪২ লক্ষ একর, যা মোট জমির শতকরা ২১ ভাগ। ২০০৮ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী দেশে মোট ট্রাক্টরের সংখ্যা দেড় লাখ। এ সংখ্যা বাস্তবের চেয়ে একেবারেই কম। বিভিন্ন সূত্রের মতে, দেশে এখন ৬-৭ লাখ ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হচ্ছে। সেচ পানির মত ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার সার্ভিস মার্কেট গড়ে উঠেছে এবং বহু উদ্যোক্তা কৃষক এগুলোতে বিনিয়োগ করছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এগুলোর কর্ষণ সেবা প্রদান করছে। ইদানিং এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৬ লাখের অধিক থ্রেসার, প্রায় ৩০ হাজার সিডার, কয়েকশত কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার এবং ৩ কোটি অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি যেগুলোর ব্যবহার কৃষি কাজের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করছে।

১৩. ফসল উপখাতে যন্ত্র প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের পাশাপাশি হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুপালনেও বিপ্লব এসেছে। বহু গ্রামীণ ও শহুরে যুবক যুবতী ও গৃহবধু ব্যবসায়িক পোল্ট্রি ও ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করছে।

এর সঙ্গে অগ্র-সংযোগ ও পশ্চাত-সংযোগ হিসাবে গড়ে উঠছে ফিড ইন্ডাষ্ট্রি, ভ্যাকসিন সেবা, রোগ নির্ণয় ও ভেটেরিনারি চিকিৎসা কেন্দ্র, হ্যাচারি, পোল্ট্রি যন্ত্রপাতি তৈরি কারখানা ইত্যাদি। পুকুরে মাছ চাষও কৃষির রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিশেষ করে ধান খেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য। তবে, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য চাষের কতিপয় উদ্ভূত সমস্যা, যেমন বার্ড ফ্লু, মাছের রোগ, ভেজাল খাবার, নিম্নমানের মুরগীর বাচ্চা ও মাছের পোনা এবং পণ্য বিপনন সমস্যা, এগুলো এ খাতের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে শ্লথ করে দিচ্ছে। এ দিকে বেসরকারি খাতের সঙ্গে মিলে সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

১৪. শেষ করার আগে আধুনিক কৃষির রূপান্তরের আরও কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ আবাদী জমির পরিমাণ কমলেও গৃহাঙ্গনের জমির মোট পরিমাণ বাড়ছে, যেহেতু নতুন বাড়ি ঘর উঠছে। তাই ‘গৃহাঙ্গনে খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থা’ গড়ে তোলার প্রতি নজর দেয়া হচ্ছে। গৃহাঙ্গনে সব্জি ও ফলমূল বাগান এবং মাশরুম চাষ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে আয় বাড়াতেও সাহায্য করছে। বর্তমান সরকারের ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘শহরাঞ্চলে কৃষির বিকাশ’। বাংলাদেশে ৩ লক্ষ শহুরে পরিবার আছে, যারা কৃষির কোন না কোন অংগের সঙ্গে জড়িত। বাড়ির ছাঁদে সব্জি, ফল ও ফুলের চাষ এবং গৃহাঙ্গণে কোয়েল, মুরগী, কবুতর পালন করে অনেকেই লাভবান হচ্ছে। তৃতীয়তঃ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে এ্যাকুয়াপনিক্স, যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে গৃহাঙ্গণে, ছাঁদে বা বারান্দায় মাছের সঙ্গে যুগপত সব্জির চাষ নতুন সম্ভাবনা তুলে ধরেছে। এসব প্রযুক্তিকে আরও প্রসারিত ও উৎসাহিত করার জন্য চাই অনুকূল নীতি সমর্থন, কৃষি সম্প্রসারণ সেবা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীকে ‘শহর ও উপ-শহর খাদ্য যোগান চেইন’ এর সাথে সংযুক্ত করা।

১৫. পরিশেষে, ধারণা করা যায় যে, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সময়ে বাংলাদেশে আবাদী জমির পরিমাণ আরও কমে যাবে, মোট কৃষি খামারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটিতে দাঁড়াবে এবং গড় খামারের আয়তন হয়তঃ এক একরে নেমে আসবে। বাড়বে মোট খাদ্য চাহিদা। কেবল চাল গমের নয়, আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে মাছ মাংস ডিম দুধ ও ফলমূলসহ পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা। এ লক্ষ্য অর্জনে লাভজনক প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটানো এবং সামগ্রিক কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নাই। রবীন্দ্রনাথ ছোট ছোট চাষীদের খন্ড খন্ড জমিতে লাঙ্গল দিয়ে কঠোর পরিশ্রমে চাষ করা দেখে বলেছিলেন, “.................. চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙ্গলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এতবড় ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে।” কবিগুরু প্রযুক্তির মাহাত্ম্য বুঝেছিলেন ঠিকই। কিন্তু বিজ্ঞান যে একদিন অসংখ্য উফশী ফসল, হাঁস মুরগী, দুধাল গাভী ও থাই কই পাঙ্গাস মাছে দেশ সয়লাব করে দিতে পারে, তা তিনি দেখে যেতে পারেননি। আমাদের কৃষকরা আর নির্বোধ নেই। উপযুক্ত প্রযুক্তি ও প্রনোদনা পেলে কৃষির কাঙ্খিত রূপান্তর ঘটানো যে সম্ভব তার প্রমাণ তারা রেখেছে। আমাদের কাজ অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো।